ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়

জনৈক আদমের সুরত

ছেড়ে যেতে হয়। হারাতেই হয় যদি কর্মসংশ্রবে, উদ্ধারে, আভ্যন্তরীণ তাগিদে, চেতনার হার্দ্য ফসলে একটিও আত্মমগ্ন শব্দবাক্য, রঙরেখার অনন্য সাধারণ উজান, বিক্ষিপ্ত জীবন-পরিক্রমার সুরছন্দ কিম্বা একটি পরাক্লান্ত অনুষ্ঠানকে প্রকাশে আনতে হয়— ফলিত সংগ্রামের আধারকে ছুঁতে হয়। যাকে ঔপনিবেশিক মাহাত্মে বলা হয় এক্সপ্রেশন। যে প্রকাশভঙ্গীর আহ্বানে তাহিতির পথে শিল্পীকে বিষাদক্ষরণের মধ্যেও এনে দেয় অন্তিম আনন্দ। যা বিষপানের পূর্বমুহূর্তে সক্রেটিসকে আঁচড়ে দিয়েছিল। যেখানে মানুষের সৃষ্টির মৌলিকতা লুকিয়ে থাকে। যা কিনা দেকার্তের অতিক্ষুদ্র বিষণ্ণ শয়তানের উত্তর-সূরী। যেখানে মৃত্যুর সম্ভাবনার মধ্যেই প্রজন্মের তিরাতির কেঁপে ওঠা— অনন্ত যাত্রা। তাকে প্রকাশ করতে, সৃষ্টি করতে— ছেড়ে যেতে হয়, হারাতেই হয়।

অথচ গোবেচারা আমাদের জীবন ননীমাখনে আত্মস্থ আছে। তার ভয় আছে, ক্ষোভ আছে, চিন্তা আছে নিরাপত্তা নিয়ে। তাকেও হয়ত বিদ্ধ হতে হয়, চিহ্নিত হতে হয় সংকীর্ণ এই সাড়ে তিন হাত মানব-জমিনের তেল খাওয়া ক্যাশবুকের ভাষায়। এই সেই জীবন মহাশয়! যার ঘুম কাড়ে ডিয়ারনেসের ভূত, উপরি ভাতার ছায়া। এই কলোসাল রিপ্রেশনের বিরুদ্ধেই তার হামাগুড়ি, ফার্সিকাল ক্রম-ডিস্‌ইলুশনড। নিধিরামের লড়াই তাকে সামাজিক করে। যে সমাজ তার মনগড়া। যে সমাজে তাকে দেনাপাওনার নিরীক্ষেই দেখতে হয়। যে সমাজ সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত জীবনের সরল বীজগাণিতিক উপেক্ষা। সাধে-আহ্লাদে, বাল-বাচ্চার নিরাপত্তায় নেয়াপাতি ভুঁড়ি শোভিত গদগদে চর্বিপিচ্ছল বেঁচে থাকা। এ সেই পুঁচকে মানুষ, লিটুল ম্যান, যে বাসে বসে পা ছড়িয়ে দেয়। মেয়ে দেখলেই ঠোঁট চাটে। সময়াবকাশে এই-ই সেই জীবন মশাই, যে আত্ম-সম্মোহনের বাহানায় নিজেকে আলাদা করতে ভালবাসে। প্রেম নিয়ে কাতর হয়। সংগ্রামবিলাসে ধিক্কার জানায়। 'স্বাধীনতা' শব্দটি তার ঠোঁট থেকে গড়িয়ে পড়লেই পিতৃতান্ত্রিক অধিকারে অতি কাছের আদরণীয় নারীটিকেও বাজে পুরে ফেলে। তার অধিকারই তাকে নির্দিষ্ট করে সব পেয়েছির ঘরে ঘরে, যেখানে 'না-পাওয়া'ই হল বিক্ষোভের তেলবারুদ। হ্যাঁ একমাত্র তার, তারই ব্যক্তিগত না পাওয়া।

আবার এও ঠিক, যে মানুষের দ্বিধা নেই, সংশয় নেই, পরস্বার্থে ভাবনা নেই— যার লড়াই, জয় পরাজয়, প্রেমপ্রীতি, উন্মেষ, প্রক্ষোভ সবই উৎপাটিত তার স্বজ্ঞান ঐতিহ্য থেকে— তবে তো সে মানুষ বরবাদ এক ইতিহাসের জীর্ণ অধ্যায়ে পাদটীকার আশ্রয় পাবে মাত্র। বিজ্ঞান তাকে শনাক্ত করবে জড় বলে। দর্শন তাকে অজ্ঞান বলবে। তখন মনুষ্যত্বের ভূমিকা নিয়ে কোন সমাজতত্ত্ব তৈরি হবে? কীভাবেই বা নির্দিষ্ট হবে শতকরা কতো ভাগে মানুষ তার নিজস্ব পরিচয়ের পথ থেকে সরে যাচ্ছে? বস্তুতপক্ষে, ঢালাও অর্থনীতি মায় খোলাবাজারের আই. এম. এফ. যাদু যতই বিঘোষিত উত্তেজনায় ইলেকট্রনিক দ্রব্যসম্ভারে আমাদের ঘরদোর উপচে দিক, যতই এক প্রান্তিক জনসমষ্টি তার পকেট ফুটো করে হাতে ফুটো বাটি ধরুক— মানব ঐতিহ্যের স্থলন কিন্তু তার অর্থনৈতিক বুনিয়াদেই সুনির্দিষ্ট থাকে। খোলাবাজারে যেমন তাকে ভিডিও বাণিজ্যের সুরাসার গিলিয়ে নেয়, তেমনই তার সাংস্কৃতিক অধঃপতনে তাকে আত্মকেন্দ্রিক এক এমন ধ্রুবকে চিহ্নিত করে যা তার জন্মসম্বল মনুষ্যত্বকে দেয় এক মোক্ষম আঘাত। সে ঝুলে থাকে, যেন কোনো কবুলতি নেই, কোনো দায় নেই। নেই কোনো আত্ম-বিশ্লেষণ। শুধু দোলা আর মরণ ঝোলা।

এতদ্‌সত্ত্বেও ইতিহাসের গতিবেগ ও সম্পন্ন রেখাচিত্রে সমাজ বাস্তবতার যে সমীকরণটি ধরা পড়ে তাতে দেখা যায় একোলসেরে মানুষ, স্বার্থপর মানুষ, দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষ তার নিজেরই অবচেতনায় কিম্বা সমাজের বাস্তবিক চাপে কখনো না কখনো, জ্ঞানে, অজ্ঞানে কোনো একটি বইয়ের পাতায় জব্দ হয়ে যায়। হয়ত কোনো একটি ছবির দিকে অপলক তাকিয়ে থমকে দাঁড়ায়। পাল্টাতে থাকে তার বাদামী জীবনের রূপ। খসে পড়তে থাকে একটার পর একটা মুখোস, তার নিজস্ব তৈরি ছদ্মবেশ। পরিবর্তিত সেই নষ্ট মানুষের ধাক্কায় গোটা বাস্তবতাটাই আচমকা প্রকট হয়ে দাঁড়ায় তার মুখোমুখি। যে বাস্তবতা তারই সাপেক্ষে গঠিত। হাইলি রিলেটিভ।

আসলে আরেকটু পরিষ্কার করে ভাবতে গেলে লিখতে হয়, প্রতিষ্ঠার মিনার থেকে সামান্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার মধ্যে যে নোডাল পয়েন্টটি গচ্ছিত থাকে সেখানে নৈরাজ্য প্রাথমিকভাবে এমন একটি বাতাবরণ তৈরি করে যার মধ্যে তৈরি হয় এক মিথ্যে দুঃসাহসের গল্প। এই গালগল্পের ফাঁকে-ফোকরে, চলনে-বলনে প্রতিটি মধ্যবিত্তই প্রায় গুঁজে দেয় তার নিজস্ব ত্যাগের ফর্দটি। যেটি সে অতি সাবধানে গচ্ছিত রাখে তারই নিরাপত্তার লকারে। এখানে সমীকরণটি খুবই সহজ হয়ে যাবে যদি আমরা দেখি তার উৎস থেকে অন্তিম যে যাত্রাপথ সে কথার ভেল্কিতে বোঝাতে চাইছে তার ভিত্তিটি কী! যেন কত হারিয়ে, কত গুঁড়িয়ে এই পাওয়া। তো কোন্ পাওয়া? চকচকে একটা মধ্যবিত্তের ভোঁতা জীবনের 'পাওয়া'র অনুসন্ধান করতে আমরা কোন্ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে যাব? তার কি খুব প্রয়োজন আছে!

ইতিমধ্যে আমার পাঠকবর্গ নিশ্চিতভাবে আমার দিকেও সন্দেহটা ছুঁড়ে দেবেন হয়ত। ভাববেন, এই প্রস্তাবিত রচনার গতিমুখ শেষাবধি কোথায় নিয়ে যাবে। আর বর্তমান লেখকেরই বা পায়ের তলায় কতটা জল, কতটাই বা বালিমাটি। কিন্তু হ্যাঁ, এ আমার স্পষ্ট উচ্চারণ, এ আমার প্রকাশ্য ধারণা (!) যে অনেক কিছু ছাড়তে চাওয়ার কল্পনা আমাকেও স্বপ্নের গহীন পথে নিয়েছে। যেখানে নিজেকে মুক্ত চিন্তা ও সৃষ্টির পাল খাটানো নাবিকের মতো ভাবতে ইচ্ছা করেছে। অথচ কই? গোটাকতক বন্ধুত্ব, সাড়ে চার তোলা প্রেম আর আড়াই রত্তির স্বীকৃতিকে ছাড়তেই তো প্রাণ ওষ্ঠাগত। প্রতিষ্ঠার মোহকে দুর্নিবার শিল্পিত মনে আধ মিনিটের জন্যেও অবজ্ঞা করতে পারছি কোথায়? পারছি না বলেই সংশয়। পারছি না, কেননা হে পাঠক, আপনি আমার কোনো অজুহাত কোনো লেখ্যভাষ্যই পড়তেন না, যদি না সামান্য পরিচয়ের সূত্রে, শুনে থাকা নামের কারণেই যেভাবে এই আত্মসমীক্ষার আধারে রচিত এই গদ্যপ্রবাহটি পড়তে শুরু করেছেন—। যেভাবে অনেকানেক বেপরোয়া জীবন ভিখারিকে আপনি মনেও আনেননি। এই প্রস্তাবনায় আমি এমন এক জীবনের কথা লিখব যাঁর প্রতি ফিরে তাকানোর সময় আপনি পাননি। যিনি সময় উল্লাসে নিষ্ফল প্রতিষ্ঠার গলা টিপে এক নৈর্ব্যক্তিক জীবনকেই কর্ম ভেবেছেন, ভেবেছেন সাধনা। যে ফেলে আসা, ঘটিয়ে তোলা, অর্জন করার সময়বেদ আমাদের লিজ্জত করে, সচেষ্ট করে কিছু একটা করার তাগিদে। ঠেলে দেয় আরেকবার··· যদি আরেকবার···

অথচ দেখুন, কিছু ছেড়ে কিছু কুড়িয়ে নেওয়া আর কিছু হারিয়ে কিছু বাগিয়ে নেওয়ার সমানুপাতিক অঙ্কে মধ্যবিত্ত মায় তাবৎ ছাপোষা মানুষ অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। অভ্যস্ত তাদের হতেই হয় কেননা দুধে লিকারে, রসেসদে তারা যেমন গাছের খান তেমন তলারও কুড়োন। তাদের ভদ্দরলোকি জীবন মানে সর্বদাই এক শঙ্কা কাজ করে: এই গেলো, এই বুঝি ছিটকে গেলাম র‍্যাটরেসের ট্র্যাক থেকে। তাই বিস্মিত হতে হয়। বিস্ফারিত এই দৃষ্টিহীন চোখে আরো আরো ঘন অন্ধকার জাগিয়ে তোলে। যখন একজন শিল্পীকে দেখি তাঁর ফেলে আসা পথ চলাতেই আনন্দ। নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া এক সংঘর্ষের বহুমাত্রিক নিঃসঙ্গ তথা নৈর্ব্যক্তিক উত্থানেই যে বেঁচে থাকতে চায়। আদৌ কি সে কিছু চায়? যা চায় তা হয়ত এঁকে ফেলা চিত্রপটের বিষয়-বিষয়ীর সামান্য স্বীকৃতি। যারা বলবে 'এই আমার ঘরদোর। এই আমার লালন-পালন। এই আমার দৈনন্দিনের অমিত যুদ্ধের ক্ষণ-মুহূর্ত।'

অজ্ঞানতার কারণেই এই অসম্ভব উদারক্ষ্যাপা সন্ত শিল্পীর প্রথম সন্ধান পাই বাংলাদেশের স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদের এই সেইদিন দেখা তথ্যচিত্র 'আদম-সুরত'-এ। যখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর পেরিয়েছে। শরীর আলগা হয়ে আসছে। প্রাথমিক পরিচয়ে মাত্রাতিরিক্ত এক জরজরে কম্পনের মধ্যে টের পাই— এ দুনিয়াকে যারা বাসযোগ্য করে যেতে চায় তার অন্তরালে থেকেও এমন কিছু বিস্ফোরক জীবনের

দায় বয়ে যায় যা আমাদের মতো সাধারণত্বে ভরা কৃমি ও পতঙ্গদের কাত করে, ডানা ছেটে দেয়। কাহিল করে তার ইনার স্ট্রেংথ্ দিয়ে। এই শিল্পী, যিনি শেখ মহম্মদ সুলতান একজন দিন দরিদ্র রাজমিস্ত্রির একমাত্র সন্তান। কৈশোরের আঁকা অসাধারণ স্কেচ এবং পেইন্টিং স্থানীয় তালুকদার-জোতদারদের মনোরঞ্জন করার কারণে— পড়াশুনায় যথেষ্ট খারাপ ছেলে হওয়া সত্ত্বেও— এঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতার আর্ট কলেজ অবধি আসার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

পাঠক, এর পরবর্তী অধ্যায় তথা সুলতানের জীবনসিঁড়ি অন্যান্য আর পাঁচদশ-পাঁচশো চিত্রকরের মতোই খ্যাতি আর স্বীকৃতির চুনসুরকিতে যথারীতি এক এক ধাপ করে পর্যায়ক্রমে ইউরোপ-আমেরিকার আর্ট-অ্যাপ্রিসিয়েশনের দরজা অবধি পৌঁছে যায়। সাথে সাথে দেশোবিদেশে সুলতান তাঁর চিত্রকলার তারিফের ডিঙিতে চড়ে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। শিল্প(আ)মোদীরা ধরেই নেন যে তিনি, শেখ মহম্মদ সুলতান, প্রতিষ্ঠানের চিরনির্দিষ্ট শার্ল, গ্যালারি, স্টুডিও তথা আকাইভগুলোতে নিজেকে সচেষ্ট রাখবেন, নিজেকে ক্রমে বন্দি করে ফেলবেন আর পাঁজন নামজাদাদের মাঝে। ঠিক এইখান থেকেই আমাদের বিস্ময়ের শুরু। এইখানেই বোধের বিস্তৃতি। তথাকথিত ধরতাইয়ের সম্পূর্ণ বাইরে, শিল্পের অত্যাধুনিক নিরীক্ষাভূমির অকপট স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন। যেন এই আবর্জনার সভ্যতা, কোলাহলের সভ্যতা, লোকদেখানো সভ্যতা, যুদ্ধজমানার সভ্যতা থেকে নিজেকে গোপন করে নিলেন। লুকিয়ে ফেললেন, আজন্ম সেই মাটির বিষাদ নিয়ে বুকে।

সুলতান সম্পূর্ণ অন্তর্গত এক আত্মজৈবনিক সাধনার আহ্বানে সাড়া দিলেন। সেটা ছিল মধ্য পঞ্চাশের পাশ্চাত্য অস্থিরতা। বাংলার সামাজিক ভাগ্যাকাশে তখনো মন্বন্তরের দগদগে ক্ষতগুলি আচিকিৎসিতই থেকে গেছে। ইউরোপের সংস্কৃতি তার রাজ্যপাট ফর্মালিজমের অধিগ্রহণে নতুন এক কালচারাল রিউম্যাটিজমে আক্রান্ত হয়েছে। মহান দুই স্পেনীয় শিল্পী গোইয়া ও পিকাসো উভয়েই কালেকটরদের সর্বগ্রাসী ব্যবসায় (তাঁদের শিল্পকৃতির জনআবেদনের বিপরীতে) ঐতিহাসিক সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন। একটি ছবিকে একশো ছাপ্পান্ন টুকরো করে নিলাম ডাকা শুরু হয়ে গেছে। ইউরোপীয় অর্থগৃধ্নু সময়কণ্টক গইয়ার 'দানব'কে ডাইনিং রুমে সাজিয়ে দিয়েছে অনায়াসে। পিকাসোর 'নৃশংসতা' ডিজাইনের গন্ডীতে হাঁপিয়ে উঠেছিল যেন এমনই কোনো সময়। শুধু সুলতানই নয়, সারা পৃথিবীর যথচারী ক্লান্তিতর্পণকারী মানুষ একটু একটু করে বুঝতে শুরু করেছিল সংস্কৃতির মূল নিয়ামক তার মানবীয় উত্থানে। জীবন বিচ্ছিন্ন রঙরেখা সুরছন্দ গদ্যপদ্য আসলে আরো বেশি নিবার্পিত জনবিক্ষোভের মলম হিসাবে অন্তর্গত স্বপ্নের গভীরে কাজ করে। ঠিক সেই মধ্যপঞ্চাশে কেউ কোথাও বুঝতে না পারলেও আজকের আবিশ্ব শিল্পমন্দায় হ্যাকনিড জীবনভাষ্য আর দার্শনিক

যৌনসম্ভার যেন লুপ্তপ্রায় সুরিয়ালিস্টদের তৎকালীন বিমুক্তির দুর্ভাগ্যে কাজ করে গিয়েছিল— তা বোঝা সম্পন্ন হয়েছে। পুরানো পাতা ওল্টাতে গিয়ে বড়ো বেশি কাতর হতে হয় সেই কারণেই। কেরুয়াকের 'অন দ্য রোড' কিম্বা গিন্সবার্গের 'ফাউল' পড়লে যেমন পাশ্চাত্যের বিমুক্ত পারিবারিক অস্তিত্বের নির্বোধ নৈরাজ্যকে স্পর্শ করা যায়। তেমনই বোঝা যায়, উৎসবে-সিনেমায়-ইমেজে-কল্পনায় ওরিয়েন্টাল জলপ্রপাত কেন, কেন এতোটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রসঙ্গত মনে রাখা যেতে পারে, সার্ত্রে যে মধ্যরাত্রেই কড়া নেড়ে থাকুক না কেন অ্যাবস্ট্রাকসন তথা অ্যাম্বিগুইটির চূড়ান্ত লোক-উচ্ছ্বাসগুলি, সেই অষ্টপ্রহরের তর্পণঅর্পণগুলি— এমন কি বিমুক্ত হওয়ার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও একই সঙ্গে আধুনিক প্রয়োগকল্পগুলিও (হারাকিরি কিম্বা চড়ক) এই এশিয়াপ্রান্তরের ঘাসজমিনে, জলেপাহাড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কলোনিয়াল সংহারবাদী মানসতা নিপাত যাচ্ছে। দৌড়ে বেড়াচ্ছে সাহেবসুবো, স্পনসর, কমিটি, গবেষক, বায়ার, প্রডিউসার ও ফড়ে।

অথচ ভেবে দেখুন একবারটি ; আমরা প্রত্যেকেই চেয়েছিলাম কিছু একটা ঘটিয়ে-ফেলি। সব ছেড়েছুড়ে চলে যাই। মিশে যাই, বিলিয়ে দিই নিজেকে— মিলিয়ে দিই সাধারণ্যে। সাধুসন্ত নাই বা হলাম অন্তত একটিবারের জন্য লোকে বলুক 'আহা কী করে ফেলল ! এমন ধনেমানে উৎসর্গীকৃত জীবনটাকে দুয়ো দিয়ে বেরিয়ে পড়লো রে ?' আমাদের উৎকণ্ঠা, পাপবোধ, প্রত্যাখ্যান আর মমতা মাখানো বোধে মননের নিহিত পরিরম্ভায় সামান্য শক্তিটুকুও সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। অথচ প্রবল ইচ্ছার অনাগত সম্ভাবনার দিকে নিষ্ফল চেয়ে থেকেছি। এক ব্যর্থ, ধ্বস্ত, ক্লেদাক্ত সময়ের অবগুণ্ঠনে শুধু কাতর হয়েছি। আবেগ নিরপেক্ষ হয়েই লিখছি, যদি একটিবারের জন্যেও পারতাম ! পারতাম নিজেকে ছিন্ন করতে, টুকরো টুকরো করতে সেই বোধের সমীপে, শিল্পের যূপকাষ্ঠে যদি পারতাম পা রাখার জায়গাটুকুকে তোয়াক্কা না করে গলা বাড়িয়ে দিতে ? আহা !

জ্ঞানী দোমিয়ের কারাবাসে থাকাকালীন চিঠিতে লিখেছিলেন তাঁর কালি ফুরিয়ে যাওয়ার নিদাঘ যন্ত্রণার্ত মুহূর্তের কথা। আমরা বুঝতে পারলাম আধুনিকতার চিত্রলেখটি কেমন করে সহজ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে, এই গত দশকেই (সম্ভবত) দালির অন্ধকার ক্যাসেলে জীবনকে সঙ্কীর্ণ যাপনের মধ্যে দিয়ে যে আরেক ফালিত বাস্তবতার সূত্রপাত ঘটল তার বিশ্লেষণ কোন ভাষায় করা যাবে ? আমরা খেই হারিয়েছি। চালিয়াত চন্দর বিজ্ঞাপনি দুনিয়ার মেগাস্টার দালি যখন ক্যাসেলের মধ্যে ঢুকেই পড়লেন তখন কোন পাপবোধ, কোন বিচ্ছিন্নতা তাঁকে মদত দিয়েছিল ! কেনইবা নিঃসঙ্গ এক জীবনচর্চার অস্থির উন্মেষের কথা বললেন দালি ? আমার পাঠক কি আমাকে মাফ করবেন— যদি বলি, এও এক পোস্টমর্ডানিস্ট ভেল্কির চরকিচক্কর। পালিয়ে বাঁচা !

এদিকে, যাইহোক, আমার বিষয় ছিল সেই অনন্যসাধারণ শিল্পী সুলতানের ছিটকে যাওয়া, ফিরে আসার দিনপঞ্জীটি আরেককার খতিয়ে দেখা। হ্যাঁ ইউরোপ ভ্রমণকালে যখন তিনি খ্যাতির তুঙ্গে। যে সময় মানুষ উত্তেজিত-অস্থির রোমকুপগুলো প্রায় নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে। ঠিক যে সময় আর কাঁটা দেয় না শরীরে, জীবনের— খ্যাতির মধ্যগগন— এমন একটা মুহূর্তেই স্বেচ্ছানির্বাসন নিলেন সুলতান। ক্যাসেলের অন্ধ-বৈচিত্র বা নির্বাণের চর্চা-সাধনা নয়। সুলতান ফিরে এলেন তাঁর উৎসে। জীবনের শুরুয়াদ, সেই বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামে— নরাইলে, নিজের গ্রামে। তাঁকে নিয়ে একটি কথাও হল না বা তিনি বলার সুযোগ দিলেন না। ফিরে এলেন আন্তর্জাতিক শিল্প-ময়দানের গৌরবময় দিনগুলোকে অস্বীকার করে। ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে। 'ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর সেখানে পাওয়া যাবতীয় যশ ও খ্যাতি আমি পুরোপুরি ভুলে যেতে চেয়েছিলাম। তথাকথিত স্বীকৃতিগুলি আমি আমার গ্রামে নিয়ে আসতে চাইনি। চাইনি এ সম্পর্কে কেউ কিছু জানুক। যখন আমার পুরানো সহপাঠী তথা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করি, আমার মনে হয় আমি যেন আবার সেই শৈশবে প্রত্যাবর্তন করেছি। যখন তাদের সাথে কথা বললাম, আমি বুঝলাম, তাদের চিন্তাভাবনা ও স্বপ্নগুলি যেন আমারই খুব কাছাকাছি। এইভাবে আমি যত আমার গ্রামের প্রত্যন্তে জড়িয়ে পড়লাম, একইভাবে ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করলাম কৃষকদের সাথে। দেন আই ফেলট্ মাইসেলফ আন্ডারগো আ ডীপ ট্রান্সফরমেশন। আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম। ইউরোপ থেকে তুলে আনা সমস্ত বিদেশী আদবকায়দা এবং ভাবনাচিন্তা অনেক পেছনে পড়ে থাকল। আই বিকেম কমপ্লিটলি হোল, ইন টিউন উইথ মাই পিপল অ্যান্ড মাই কান্ট্রি। দিস ট্রান্সফরমেশন গেভ মি ডীপ ফিলিংস অফ পীস অ্যান্ড কনটেনটমেন্ট।'

তো ফিরে এলেন সুলতান। আশ্রয় নিলেন জংলা গাছগাছালিতে ভরা পরিত্যক্ত মন্দিরে। না, কোনো পরিপাটি ঘরদোর তিনি সাজাতে পারেনি। 'যেন নৈঃশব্দের অথবা কোনো শূন্যসময়ের বিনীত জাগরণে একটি একটি করে ভাষার মুকুলগুলি ফুটিয়ে তুললেন তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার মাঠে প্রান্তরে। অথচ দেখুন আমরা আছি যেই কে সেই। অ্যাগ্রেরিয়ান ভিজনকে আয়ত্ব করার জন্যে পুঁথিপত্র ঘেঁটে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ সাজিয়ে, বাকতাল্লার জাবর কেটে, সেমিনারে-সভা-সমিতিতে আপ্রাণ বজায় রাখতে চেষ্টা করছি অন্তঃসারশূন্য র‍্যাডিকালইজম। চেষ্টা করছি বোঝাতে : কতো, কতো অনুগত আমরা প্রগতির নাড়ীর টানে। একবার ভেবেও দেখছি না ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থমগ্নতা আর শ্রেণী-নিবন্ধ আমলাতান্ত্রিক গণঅহংকারে আমাদের মর্মান্তিক মানবিক দুর্গতি কি নিদারুণ এক পচনসম্ভব অনুষ্ঠান ঘটিয়ে তুলেছে।

উধাওসন্ধানী এই শিল্পী কিন্তু আপাত বিযুক্তির ভরে নিজেকে সেই জীবনচর্চা ও শিল্পকৃতির ঐকান্তিক যোগসূত্রে চিহ্নিত করলেন। যাঁর জীবন শুরু হয়েছিল ইউরোপীয়ান মাস্টারদের প্রভাবসম্বল ক্যানভাসের রঙরেখায়, তিনিই সরে এলেন

সম্পূর্ণ জ্যান্ত এক বাস্তবতার অধরায় ধরা দিতে। তাঁর নিশ্চয়ই জানা ছিল, বাস্তবতার একমুখি সরলতা বিষয়ক বিতর্ক সারাদুনিয়াব্যাপী শৈলীসংস্কারের প্লাবন ঘটিয়ে ফেলেছে। তাঁর এও জানা ছিল, বিমূর্ত চিত্রপটের বহুমাত্রিক প্রকাশ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা সাম্প্রতিক কালে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। তবু? তবু সুলতান তাঁর আত্মগত বিপন্নতারই শুধু নয়, দুর্গতি-ক্লিষ্ট গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে অকৃত্রিম সখ্যে নেমে আসেন শেকড়ের দিকে, কোন সে যৌথ-অবচেতনার ঐশ্বর্যের গভীরে।

এইভাবেই শুরু হল তাঁর, শেখ মহম্মদ সুলতানের গত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের কৃচ্ছ্রসাধন, শিল্পযোগযাত্রা। অযুত ক্যানভাসের সরসতায় রঙের বৈচিত্র, রেখার বিচিত্র সম্পাদনায়, পরীক্ষানিরীক্ষার সরলজটিল ছন্দে চিত্রিত করলেন আধুনিক শিল্পকারুতন্ত্রের এক তৃতীয় ভুবন। বহুমূল্য বিদেশি রঙ পরিহার করে তিনি বেছে নিলেন দেশজ পটুয়াদের গাছগাছালি, শেকড়বাকড় থেকে উদ্ভূত রঙ। স্বল্প খরচায় অনেক বেশি ও বড় কাজ করতে হলে দেশি দ্রব্যাদি ব্যবহারই শ্রেয়। সুলতান বলেন, 'প্রথম দিকে আমি জুটের কাপড়ে শিরীষের আঠা ব্যবহার করতাম। কিন্তু দেখা গেল বর্ষায় ক্যানভাসগুলোয় ড্যাম্প ধরে যাচ্ছে। তখন আমি গাবের আঠা ব্যবহার করতে শুরু করলাম। যা কিনা জেলেরা তাদের জালের জন্যে ব্যবহার করে।'

মধ্যপঞ্চাশে দেশে ফিরে সুলতান প্রাথমিক স্তরে অসম্ভব কিছু ল্যান্ডস্কেপ আঁকতে শুরু করেন। মানুষ সেখানে ততোটা গ্রাহ্য নয়। যেন জীবনানন্দীয় প্রাতিস্বিক বোধ আর শস্যক্ষেত্রের জৈবিক উপমা-সমাহার। প্রগল্‌ভ উষ্ণতায় শিল্পী তাঁর কাঙ্ক্ষিত চিত্রসমূহে আরোপ করেন এক বাদামী সভ্যতা। জানিয়ে রাখা ভাল, তিনি বলেন, 'তুমি দেখবে ব্রাউন ইজ দ্য ডামিনেন্ট কালার। কেননা ব্রাউন হল মাটিপৃথিবীর, ঘরবাড়ির আর কৃষকের রঙ। এই বাদামী রঙ এবং কার্ভড ফর্মস ক্রিয়েট আ ফিলিং অফ ইউনিটি ইন মাই পেইন্টিংস। বলা হয় বাংলাদেশ হল পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব দেশ। কিন্তু তাই-ই বা হবে কেন? এখানে কৃষকের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সঙ্গীতময় হয়ে আসছে স্মরণাতীত কাল ধরে। উদাহরণস্বরূপ তেভাগা আন্দোলন এবং আরো কতো সব। অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করে, এই আধুনিক যুগে কেন আমি আমার ছবিতে কৃষকদের এতো সেকেলে করে আঁকি··· আমি তাদেরকে বলি যে ওরা আজও প্রাচীন। ওরা আজকে কী করছে? দিস কালটিভেশন অফ ল্যান্ড ইজ প্রিমিটিভ ওয়ার্ক। সো দেয়ার এন্টায়ার একজিসটেন্স ইজ প্রিমিটিভ। দেখ আমি এইসব আদিম মানুষদের বেছে নিয়েছি আমার ছবির বিষয় হিসাবে কেননা দে আর আউটসাইড দ্য টেরর অফ আওয়ার প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড। বৃহৎ শক্তির কসমোপলিটান শহরগুলোতে আজ কী হচ্ছে, কীভাবে তারা নিজেদের নিউক্লিয়ার হলোকাস্টের জন্যে তৈরি করছে। আমার বিশ্বাস এইসব শহর অভিশপ্ত হয়ে পড়েছে। একদিন তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করে ফেলবে। কিন্তু আমি ভেবে দেখেছি, আমার

ছবির এইসব মানুষজন, এইসব ধ্বংসের দিকে আত্মহননের দৌড়ের থেকে অনেক বাইরে। আই ফিল দ্যাট দে উইল আউটলিভ আ নিউক্লিয়ার হলোকাস্ট। দে উইল কনটিনিউ টু কালটিভেট দেয়ার ল্যান্ড অ্যাজ অলওয়েজ।'

ইতিমধ্যে মানুষ এসেছে তাঁর ছবিতে আদমের রূপ নিয়ে। বলিষ্ঠ, সুগঠিত শরীরের মধ্যে বীরত্বের প্রতীকী নিয়ন্ত্রণ। বিস্তৃত আর অনন্ত তাঁর ক্যানভাসে ধরা পড়তে শুরু করে শ্রম ও কর্ষণের অভিনব সব মুহূর্তগুলি। সুলতান ছিলেন পরিবারবিচ্ছিন্ন একাকী জীবনে অভ্যস্ত। তাঁর এই একলা চলার পেছনে কোনো গূঢ় বার্তা কাজ করে ছিল কিনা আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। তবে জানিয়ে রাখি, জীবনের শেষার্ধে এসে তিনি সামাজিকভাবে দায়িত্ব নেন নিম্নবর্গের মধ্যবয়স্কা (প্রায় প্রৌঢ়া) এক হিন্দু বিধবা রমণীর। যার দুই সন্তানের সঙ্গে সুলতান নিজেকেও গ্রথিত করলেন পারিবারিক আস্তানার সহজিয়া বাস্তবতায়। এর পরপরই যেন দেখা যায় সুলতানের ছবিতে মানুষ এক বিশেষ ভূমিকা নিয়ে রঙরেখার বৈশিষ্ট্যে প্রতিভাত হতে শুরু করেছে। এই মানুষ আমাদের চোখে দেখা মানুষের থেকে যেন অনেক বেশি বলবান, মাসকিউলর। এদের যেন নিরন্তর শ্রমের প্রতীকে চিহ্নিত করে সুলতান তৈরি করতে চান এক দুর্দান্ত 'মিথিকাল ইভেন্ট'। তাঁর ক্যানভাসের মানুষজন, গাছপালা, প্রকৃতিপাথর যেন আর্কিটাইপাল চিত্র-চেতনার জন্ম দিয়ে যায়। তাঁর চাষি যেন সেই আদমের আদলে, উৎসের গভীর গোপনে এক ক্রান্তিকারি, স্বপ্নচারী সৃষ্টির জাল বুনে যায়। আমাদের বিদ্ধ করে। নিজেদের অজ্ঞানতায়ই বিপন্ন বোধ করি আমরা। বুঝতে চেষ্টা করি, কেন হাজারো ছবি এঁকে একটিও বিক্রি করার তাগিদ অনুভব করলেন না সুলতান, এখনও পর্যন্ত।

যেহেতু আমার বিষয় ছিল এক অনন্য সাধারণ শিল্পী মানুষের পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে আমাদেরই ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ, আমাদেরই অজ্ঞানতা, আমাদের নষ্ট সভ্যতার বিশ্লেষিত মুহূর্তগুলি খুঁচিয়ে দেওয়া, তাই আপাতত সেই শিল্পী শেখ মহম্মদ সুলতানের মুখের কথাগুলিকে বাঙ্ময় অভিযোজনে সাজিয়ে এই নিবন্ধের শেষ পর্যায় প্রবেশ করব : 'ক্ষমতায় আসীন লোকেরা সবসময়েই দরিদ্র কৃষকদের জন্যে কুম্ভীরাশ্রু ফেলে। তারা দেখায় যে তারা কৃষকের কতো বন্ধু। কিন্তু এ সমস্তই ভাঁওতা। তারা কখনোই কৃষকের পাশে দাঁড়ায় না। যদি তা সত্যি হতো তবে আমি কৃষকের সঙ্গে তাদের কাজ করতে দেখতাম। দেখতাম, তাদের সঙ্গে খেতে-খামারে কাজ করতে। তাদের সংগ্রাম ও দুঃখের অংশীদার হতে। বৈদেশিক সাহায্য যা কিনা আমাদের দেশে কৃষকের নামে উপচে পড়ছে, তা কিন্তু কখনোই চাষির ঘরে পৌঁছায় না। সমস্তটাই শহরে আটকে থাকে। এবং তুমি জান তা দিয়ে কী হচ্ছে? কতিপয় বড়োলোকদের বিলাসসামগ্রী কেনা হচ্ছে। যদি আজ কিংবা কাল এই বৈদেশিক সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়, তখন কী হবে? শহর শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু গ্রামে? কিচ্ছুটি ঘটবে না। কোনো পরিবর্তনই দেখা যাবে না। গ্রামের চাষি সবসময়েই বেঁচে থাকবে। আরেকটা সমস্যা হল কৃষককে

বোঝানো হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি ঐতিহ্যবাহী দেশজ পদ্ধতির থেকে অনেক ভাল! মাঝে মধ্যে আমি টেলিভিশন দেখি। কোনো একটা অনুষ্ঠানে কিছু চাষিকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনারা কি জানেন এই গাছের চারা দিয়ে কী করা হয়? বলতে পারেন এটা কোন জাতীয় গাছ?' যখন কোনো চাষি বলে যে এটা কোন ধরনের বা কি। তখন তাকে বলা হয়, 'ওফ! না না না। এটা তা নয়।' তারপর এক তন্বীর ছবি ভেসে ওঠে টিভির পর্দায়। সে পাঠ করতে থাকে কিছু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আর বলে, 'ইউ আর নট রাইট। ইউ হ্যাভ দ্য রঙ আইডিয়া। দিস প্ল্যান্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি ' ইত্যাদি ইত্যাদি। যাদের এই কথাগুলো বলা হচ্ছে সেইসব কৃষকের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি দেখতে পাই তাদের প্রাচীন বাপচোদ্দপুরুষের পেশাগত গর্ব ধ্বংস হতে চলছে। এবং তার পরিবর্তে জায়গা নিচ্ছে নতুন ধরনের হীনমন্যতা। এরাই হল আমার ছবির বিষয়। আই ক্যান নট হেল্প বাট ফিল ফর দেম··· ফর দেয়ার ডে টু ডে কনসার্ন'স, প্রবলেমস, স্ট্রাগলস। তুমি কি একটা বিষয় জান? আজকের চাষি আর গান গায় না! জারি-সারি সেইসব লোকসঙ্গীত আজ আর গ্রামাঞ্চলে শোনা যায় না। আসলে কোনো না কোনো ভাবে কৃষকের কাছ থেকে তার গানকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ইদানিং শহরের লোকজন তাদের কৃষকদের লোকসঙ্গীত প্রডিউস করছে। কিন্তু তারা সেগুলো সম্পূর্ণ বিকৃত করে শোনাচ্ছে। এবং এই কৃষকরা যখন শোনে তাদের সেই পুরোন গানগুলো রেডিওতে কিম্বা টেলিভিশনে বাজানো হচ্ছে, দে ফিল দেয়ার মিউজিক··· হুইচ ওয়াজ দ্য অরিজিনাল এক্সপ্রেসন অফ দেয়ার জয়েস, দেয়ার পেইনস, দেয়ার সরোজ··· দে ফিল দিস মিউজিক ইজ বিইং মেড আ মকারি অফ, অ্যান্ড দে বিকাম টেরিবিলি স্যাড।

অবশেষে ছায়া নামে। ক্রমে এক গাঢ় অন্ধকারে আমাদের প্রতিশ্রুতির সলতেগুলি নিভে যায়। গত একটা দশক আগেও আমরা কোমরবেঁধে নেমে পড়তে পারতাম কোন জাহান্নামের অচীন দেশের পথে। সম্বল ছিল একটাই 'কিছু করা'। কিছু একটা বুঝে ওটা, বুঝিয়ে দেওয়া। যে ধ্বংসপ্রায় যোগাযোগের সেতুটা এখনো স্বপ্নে দেখতে পাই, সেখানে উড়ুক্কু দার্শনিক ছেলেছোকরার দল হাতের তালুতে গাঁজা টিপতে টিপতে গেয়ে ওঠে 'চ্যাংড়া বন্ধুরে··· ঘর তুইল্যা দে নদীর কিনারে'। ভয় হয়, যে ঘর যে বাসা আমাদের পূর্বপুরুষের রক্তে মেধার মজ্জায় তৈরি ছিল তা কি আমরা চিনতে পারলাম! আমরা কি বুঝে উঠতে পারলাম কিছু একটা করার আগে, কিছু একটা বোঝা দরকার, কিছু একটা ধরা দরকার। তাকে যদি না-ই ব্যস্ত করতে পারলাম তাতে কি! হলই বা তা সেই অধরা-অবলা অবাঙমানসগোচর। যা কিনা আমাদের পাওয়া ও খোঁজার নীলমনি আঁধার কালো স্বপ্নের কোরক।

ছাড়তে চাওয়া, হারিয়ে খোঁজা তো অনেক পরের বিষয়। আপাতত সুলতান, শেখ মহম্মদ সুলতান আমাদের অপদার্থ দিন যাপনের মুখে কালি মাখিয়ে দেন! অজড় খিলানগুলি শব্দ করে ওঠে। বেজে ওঠে অপদস্থ জীবনের ভাঙা রেকর্ড। □

কৃতজ্ঞতা : তারেক মাহমুদ-এর তথ্যচিত্র 'আদম সুরত'॥